প্রচ্ছদ ঃ যামিনী রায়

রাত্রিকে দিনকে ঃ দক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রথম প্রকাশ ঃ ২৫শে চৈত্র, ১৩৬৭। প্রকাশক ঃ সুধাংশু গুপ্ত, ভাবীকাল প্রকাশনী, ১১৬।১সি. বি, এম. রোড, কলকাতা-১০, মুদ্রক ঃ শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী, শ্রীতারা প্রেস, ৩১।৪ রামতনু বোস লেন, কলকাতা—৬ প্রাপ্তিস্থান ঃ শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, মন্দ্রেরণ সিণ্ডিকেট, ৬৪।১৩ বেলগাছিয়া রোড, কলকাতা-৩৭ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান গ্রন্থালয়। দাম চার টাকা।

দিনেশ দাস

বন্ধুবরেষু

সূচীপত্র

এক নীলকণ্ঠ পাখির গান

আমাকে কাঁদাতে পারো বলেই তো
বার বার তোমাকেই চাই,
আমার কান্নার সাথী
তুমি কিংবা তোমার প্রতীক
কোনো ছবি কিংবা কোনো গান
অথবা সংলাপ,
উল্লাসে উন্মাদ হয়ে উঠি
যে মুহূর্তে কিছু কাছে পাই।

আমাকে কাঁদাতে পারো বলেইতো
এতো করে তোমাকেই চাই,
যন্ত্রণায় নীলকণ্ঠ আমি
তবু রাত্রি মনোরম শুক্লা সুষমায়
অশ্রুকণা তারা হয়ে জ্বলে
মুক্তার বিন্দুর মতো,
আমরা কালের বুকে মালা হয়ে দুলি,
তুমি আমি উভয়েই বুঝি জাতিস্মর
জন্মে জন্মে পরস্পর অন্যেরে কাঁদাই।

আমাকে কাঁদাতে পারো বলেই তো।
বার বার তোমাকেই চাই।

তবুও যে চাই

তেমনি পুতুল বাইরে দেখে থমকে দাঁড়াই,
হাত বাড়িয়ে যায় না ধরা অনেক সে দূর।
যা কিছু চাই তাই পাওয়া কি সহজ কথা ?
তবুও যে চাই তবুও যে চাই তবুও যে চাই !

এলোমেলো অনেক কথাই পাখির মতন
উড়ে বেড়ায় এদিক সেদিক মনের বুকে,
কিন্তু বৃথাই ঝড়ের ভাষা শেকল-বেড়ি।
তবুও যে চাই তবুও যে চাই তবুও যে চাই !

ঝিনুক মনের অস্থিরতায় স্মৃতির দহন,
দিগন্তে মেঘ যখন তখন বৃষ্টিধারা ;
সব আয়োজন দেয় ভাসিয়ে বন্যা এসে,
তবুও যে চাই তবুও যে চাই তবুও যে চাই !

নিজ খেয়ালেই অন্ধকারে শিউলি ঝরে ;
অবুঝ ভালোবাসার নেশায় মগ্ন থেকে,
সন্ধ্যেবেলায় ধূসর মরু নির্জনতায়—
কেবল খোঁজা আলো কোথায় আলো কোথায়
আলো কোথায় !

তবেই আবার আলো

এ আমার অভিজ্ঞতা :
আমি এক অনভিজ্ঞ প্রবাস-পথিক
সুবিশাল ইতিহাস সমুদ্র-সৈকতে।
ইচ্ছের আবর্তগুলি রক্তের বুদ্‌বুদ্‌,
মুহূর্তে অনেক হত্যা কঠোর শাসন ;
আমি, তুমি হস্তারক, প্রতিদিন আমাদের
প্রত্যেকেই নিয়মিত ফাঁসির আসামী।

অনুভবে শৃঙ্খলিত সব ক্রীতদাস,
ক্রমে ক্রমে সকলেরই সাহারা শরীর।
কোনোই সান্ত্বনা নেই, শুধুই আক্ষেপ ;
বন্ধনের বঞ্চনার শুধু বেড়াজাল !
বিক্ষত সমস্ত চোখ পিপাসা-আকুল,
একে একে একদিন সবই মরুভূমি ;
সহসা ভাষার যাদু নিস্তব্ধ সেখানে,
যখন নিশ্চিহ্ন আশা শূন্যতা আড়াল ;
তখনই ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ঘোর অন্ধকার,
অখণ্ড আলস্যে পিণ্ড সমগ্র পৃথিবী।
সেখানে মৃত্যুর ছায়া, সেই ছায়া কেটে
তবেই আবার আলো হঠাৎ কখনো
ঘটে যদি অকস্মাৎ সূর্য-বিস্ফোরণ।

একটি নমস্কার

(মনোমোহন ঘোষ জন্ম শতবার্ষিকীতে)

শীতের শিশিরগুলি সেইদিন মুক্তো হয়ে ঝরেছিল
শতবর্ষ আগে, সমুজ্জ্বল মধ্যমণি কৃষ্ণধন-স্বর্ণলতায় ;
দশ থেকে পঁচিশের দিনগুলি কেটে গেছে পশ্চিমী হাওয়ায়,
তারপর ফিরে এলে সারা দেশ সবিস্ময়ে নড়ে উঠেছিল।
বিমোহিত চমকিত শিক্ষিত ইংরেজ যাঁর কাব্য-প্রতিভায়,
মানবতাবোধে বুদ্ধ যে কিশোর পাণ্ডিত্যে প্রজ্ঞায়—
শাসকের ধর্ম নয় কখনো শোষণ, তাঁহারই ঘোষণা ;
দেখে যেতে নিষ্ঠুর শাসন আমন্ত্রণ বিলিতি বন্ধুরে,
নুন-ভাত খেয়ে বাঁচা দরিদ্র ভারতে, তাও চলিবে না ?
অন্যায় লবণ-কর, ডাক আসে, আন্দোলন চাই প্রত্যুত্তরে।
তাঁরে পেয়ে গুরুরূপে ভারতের সারস্বত মহলে হিল্লোল,
মালতীর কণ্ঠলগ্ন সে মাণিক্যে বিচ্ছুরিত আলোর কল্লোল
কবিতার রস প্রস্রবনে। নব নল-দময়ন্তী নাট্যে রূপায়ণ,
সেবাধর্মে প্রাণময় প্রেমময় অসামান্য সে মনোমোহন।
প্রিয়ারে হারায়ে শুধু মালাগাথা প্রেম আর মৃত্যুর সঙ্গীত,
দৃষ্টি তাঁর নিভে আসে যুদ্ধক্লান্ত এ বিশ্বসংসার ;
পঞ্চান্নর শেষ শীত মনীষী বিদায়, নড়ে ওঠে পৃথিবীর ভিত,
শতবর্ষ অন্তরালে অরবিন্দ অগ্রজেরে নত নমস্কার।

গাঁয়ের খবর কেমন বলো

এলেই যখন খানিক বোসো,
গাঁয়ের খবর কেমন বলো।
হামলা এবং মামলাবাজি
কমলো কিছু? নাকি যেইসেই
আগের মতোই নিত্য বিবাদ?
চোরের উৎপাত তেমনি আছে,
তাই না মোড়ল? তামাক খাবে?
লজ্জা কিসের? খুলেই বলো।
এলেই যখন খানিক বোসো,
গাঁয়ের খবর কেমন বলো।

ফসল এবার কেমন মাঠে?
ভালোই হবে করছি আশা।
ধানের গোলায় পুলিশ হাজির
হলেই সবার মাথায় বাড়ি!
কিন্তু শোনো, দেশটাকে তো
বাঁচানো চাই। উঠছো কেন?
লেভি দিতে হবেই হবে।
তাই না মোড়ল? তামাক খাবে?
এলেই যখন খানিক বোসো
গাঁয়ের খবর কেমন বলো।

ছেলে তোমার ইস্কুলে যায়,
তাই না মোড়ল? একটু বাবু?
তা হোক তবু লেখাপড়া শেখা ভালোই।
তবে কি ভাই বলছি শোনো,
চাষ ছাড়াটা ঠিক হবে না, বুঝলে কিনা।

আরেক কথা,
মেয়েটাও তো ডাগর হলো ;
তাই না মোড়ল ? এবার বে-থা দিয়ে ফেল।
জানোই তো ভাই কালের যে কি রকমসকম,
কী দরকার দায় ঘাড়ে রাখার ?
উঠছো কেন ?
এলেই যখন খানিক বোসো।
তামাক খাবে ? লজ্জা কিসের ?
ঐ যে হুঁকো তৈরি হয়েই কাছে আসে।

পদযাত্রা পথে

এ জীবন পার হতে হতে
চড়াই উৎরাইয়ে
ভালোমন্দ যা কিছু কুড়োই
কিংবা নুড়ি সমুদ্র সৈকতে,
সে সবের কার কতো দাম
দুঃখের নগদমূল্যে দরাদরি
দেহ-মন মাটির যন্ত্রণা
বিস্ফোরণে নতুন জগৎ
উদাস উদাস হাওয়া কখনো কখনো।

আশাগুলি সবই তো প্রার্থনা
রুরকেলা ভিলাইয়ে বা
টাটা স্টীল বার্ণ দুর্গাপুরে
আকাঙ্খাব লকলকে ।জহ্বা
কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা পড়ে
সময় সময়, তবুও নিশ্চয়
উচ্চারণে বীণার ঝঙ্কার
মনের আনন্দ কিংবা
বেদনারই সৃষ্টি সব গান।

গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে লক্ষ্যহীন চলা
অথবা গঙ্গার ধারে অলস আলাপ
প্রসন্ন মমতাসিক্ত পতঙ্গ গুঞ্জণ
রৌদ্র-হাসি মেঘের আড়ালে
কোনোও বিরল দিনে শিলাবৃষ্টি শেষে

স্নান সেরে ঝড়ের নদীতে
হৃদয়কে ঢেকে নিয়ে স্মৃতির কাঁথায়
সময় পাখির কণ্ঠে
বিদায়ের শঙ্খ যেই বাজে
কলরব কোলাহলে সব ফেলে রেখে
পদযাত্রা ধ্রুবলোক পথে।

কালের রাখাল

তবু বেঁচে থাকতে চাই।
বেঁচে থাকার জন্যে যে প্রাণটুকুর
একান্ত প্রয়োজন, তার ওপর
অসম্ভব পীড়ন সত্ত্বেও বেঁচে থাকার
প্রলোভন আমাকে পুতুলের মতো
নাচায়, বুদ্ধি জোগায় এবং যুদ্ধের
উন্মাদনা দেয়।

পৃথিবীতে এত সুখ!
কোথায় যাব সেই আনন্দের হাট ছেড়ে?
না, চলে যাবাব কথা অমি ভাবতেই পারি না।
এত দুঃখ, এত সংগ্রাম, এত কদর্য কোলাহল—
তবু তারই মধ্যে বেঁচে থাকতে চাই।
দেখে যেতে চাই সমস্ত আগাছা আবর্জনা
পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে, এবং
এই পৃথিবী এক সুন্দর বাগিচার
রূপ নিয়েছে।

নিরিবিলি এক এক সময় ভাবি,
আমি যদি বাবার মতো বড়ো হতে
না চাইতাম, যদি এখনো পাঠশালার
ছাত্র হয়েই থাকতাম, তা'হলে আগামী দিনের
অনিন্দ্যসুন্দর সেই বিশ্ব-বাগিচায়
অনেককাল ধরে যেমন খুশি
ঘুরে বেড়াবার আমিও সুযোগ পেতাম!

এখন আমি স্বপ্নের সৌরভে মাতাল,

মনে হয় সেই নতুন সৃষ্টিরই
গর্ভ-যন্ত্রণার কাল চলছে এখন।
সেই যন্ত্রণার পরিবেশেই দেখছি,
স্বপ্ন যেন আজ সত্য হতে চলেছে।
তৃতীয় নয়নের দৃষ্টি চেতনায়
কবিরা যে যুগে যুগে কালের রাখাল!

এ এক সার্কাস

মনের কথা মনেই রাখি, বলবো কাকে ?
পেণ্ডুলামের মতোই চিন্তা দোদুল্যমান ;
মধ্যরাতের হিমেল হাওয়ায় ভাবছি জেগে—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কোথায় বা শেষ !

এখন আমি ভিড়ের থেকে অনেক দূরে,
হিসেব নিকেশ শেষ করেছি বেশ কিছুকাল ;
মুশকিল আসান হবার পরে কী আর থাকে ?
ভাবছি জেগে মধ্যরাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কবেই বা শেষ !

আজ আছি কাল হয়তো বা নেই এইতো জানি,
বালির ওপর ঘর বেঁধেছি কার কিবা দোষ ?
কৃত্রিমতায় জর্জরিত ভালোবাসার প্রতিকৃতি,
সবটুকুতেই অনিশ্চয়ের কাঁচের বেড়া।
তাইতো ভাবি ঠাণ্ডা হাওয়ায় রাত্রি জেগে—
এ সার্কাসের কবে শুরু কোথায় বা শেষ !

উদ্যানে আর ফুল ফোটে না, পাখির কুজন—
বন্ধ সে সব অনেক দিনই। কৃষ্ণচূড়ায়
দূর থেকে রোজ নিজকে দেখি, রক্ত ঝরে।
বুকের তলায় শুকনো গোলাপ শেফালিদের
আগুন জ্বলে আগুন জ্বলে আগুন জ্বলে !
নীরব হাওয়ায় রাত্রি জেগে তাইতো ভাবি—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কবেই বা শেষ !

বিক্ষত প্রাণ রিক্ত হৃদয় ভালোই আছি,
এখন আমি শূন্য দু'হাত, ভগবানের

অনেক কাছে।   পাশেই যে তাঁর আমার আসন,
দুই প্রবীণে এখন সুখে আলাপসালাপ!
বিগত দিন বিষণ্ণতার ছায়ায় ভাসে,
সব ফুরিয়ে প্রসন্নতায় এবার খুশি।
ভাবছি শুধু মধ্যরাতের হিমেল হাওয়ায়—
এ সার্কাসের কবে শুরু, কোথায় বা শেষ!

দিনগুলি পরমায়ু

সময় পাহাড় যেন ধ্বস নামে কখনো কখনো,
তবুও প্রত্যহ ভোরে গানের কলির মতো
একেক দিনের জন্ম অহঙ্কারী সূর্যের সন্তান।
কাঁচের জানালা বেয়ে যে মুহূর্তে রৌদ্রের জোয়ার,
প্রাতঃস্নান পৃথিবীর সুপবিত্র উষার নির্ঝরে।
হৃদয়ের মানচিত্রে গন্ধরাজ ফুল ফুটে আছে,
একটি সুন্দর বিন্দু মোহময় স্বর্গ অভিলাষ।
কতো সাধ কতো স্বপ্ন, মানুষেব পদতলে চাঁদ ;
এরপর আরো আছে আরো আছে বিস্ময় ঝাঁপিতে !
আলোব টুকরোগুলি আশ্বাসেরই একেকটি ছায়া,
দুশ্চিন্তার চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত তবুও জীবন ;
মেঘেদের ঘোরাঘুরি সমুজ্জ্বল দিনের আকাশে,
খণ্ড খণ্ড অন্ধকার উদ্ভাসিত গ্রহণ সত্তায়।
দেখে দেখে বেপরোয়া অবিরাম মৃত্যুর মিছিল,
সকাল দুপুর শেষে ক্রমে ক্রমে বিকেলও ফুরোয়
ক্ষয়ে ক্ষয়ে প্রতিক্ষণ আমাদের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে।
তারপর সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে অহল্যা নির্জনে,
বৃন্দাবনে বাঁশী বাজে : প্রাণময় পুরুষ-প্রকৃতি ;
তৃষ্ণার সমুদ্রে জাগে ঘনঘন প্রজাপতি ঢেউ।
রাত্রি গর্ভ-যন্ত্রণার কাল তন্দ্রাবেগে সমাচ্ছন্ন নীল :
আবার আসন্ন দিন, অহঙ্কারী সূর্যের সন্তান !
ধানের শীষের মতো, অথবা ফুলেরা যতো
আদিগন্ত লতাগুল্ম সমুন্নত বৃক্ষের সমাজে
গানের ভেলায় ভাসে নির্ধারিত অস্তিমের পথে,
দিনগুলি জীবেদের আমাদের দীপ্ত পরমায়ু,
আলোর আশায় রাঙা প্রাত্যহিক সবল প্রত্যয়ে।

সকালে বিকেলে

ট্রেনযাত্রী। রাত্রি ভোর গাঁয়ের স্টেশনে,
মাটির ভাঁড়ের চায়ে অদ্ভুত আস্বাদ।
অনেক দেরিতে তবু নতুন বর্ষার জলে
মাঠে মাঠে দেখা দেয় নতুন ফসল।
আশ্বাসে চাষীর মন ভরে ওঠে—
বেঁচে যাবে এবারের মতো,
পারবে বাঁচাতে আপামর দেশের মানুষে।

বীরভূমে রাঙা মাটি হাসে ;
রোদ-বৃষ্টি ঝলকে ঝলকে,
দিনটি ভালোই কাটে আলো আর
ছায়ার খেলায়। সহসা খবর—
অজয়ের বাধ ভেঙে ভেসেছে প্রান্তর ;
সাত হাজার একরের কৃষিভূমি
জলের তলায়, ডুবে আছে বহু লোকালয়।

চাষীদের মুখগুলি সে সংবাদে
মুহূর্তে মলিন। আবার মাটির ভাঁড়ে
চায়েতে চুমুক, এবার বিস্বাদ।
সকালে সুখের ছবি, বিকেলে বিষাদ !

দর্পণে মুখ

দর্পণে যেই মুখের ছায়া হাজার স্মৃতি ;
অতীত মুখর, মৌনী আমি অবাক লাগে।
হারাণো দিন হারাণো মন যায়না পাওয়া,
তবুও ভাবা তবুও ভাবা তবুও ভাবা !

সুখের নেশায় আসল-নকল বিচার ছেড়ে
সময়টুকু কাটিয়ে দিয়ে যখন ফকির,
শুধু শুধুই চিন্তা তখন, কি লাভ তাতে ?
চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি !

জমা-খরচ হিসেব নিকেশ অনেকদিনের,
আর কি হবে জের টেনে তার ভূতের বেগার ;
থাক বাড়িঘর আর যা কিছু মিথ্যে বোঝা
বৃথাই টানা বৃথাই টানা বৃথাই টানা !

অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবেই আছি,
বড়াই তবু জগৎটাকে পুরোই জানি ;
জানাজানি টানাটানির মেয়াদ ফুরোলো,
যেতেই হবে যেতেই হবে যেতেই হবে !

ওপার থেকে এপার এসে সওদা সারা,
কালের নৌকো চলছে বেগে আপন ভাবে ,
ছিলেম কোথায় এলেম কোথায় এখন ভাবি—
কোথায় যাবো কোথায় যাবো কোথায় যাবো !

অভিষেক

ফণা তোলে ক্রুদ্ধ বাতাস,
নামে ঝড় বিপুল হৃদয়ে ;
চারদিক ধুলোয় ধূসর,
ক্রমে ক্রমে প্রমূর্ত পুরুষ।
এ পৃথিবী প্রতিবিম্ব তোমার আমার,
চেতনার পরিস্রুত প্রতিপ্রক্ষেপণ ,
রাত্রি-শক্তি কালী অন্ধকার
অপসৃত জ্ঞানের বিকাশে।

ইচ্ছে নাচে শিরায় শিরায়,
স্তূপীকৃত সঞ্চিত বাসনা ;
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সংঘাতে
কদাচিৎ অমৃত মন্থন !
জীবনের দৃষ্টি ফেবে সহসা কখনো,
রক্তের আগুনে দেখি আলোর আকাশ
স্বর্গ নামে মানব সত্তায়,
অভিষিক্ত বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে।

এখনো তাই

সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।
আম জাম নারকেল লিচু আর কুলের বাগান,
পাকা তাল কাঁঠালের খেজুরের সুগন্ধে আকুল ;
এখনো অশ্বথ বট তেতুল হিজল
দেবদারু বাঁশঝাঁড় ছায়া দেয় হাওয়া দেয়
দুই বাঙলা জুড়ে
ক্লান্ত পথিকে, গৃহে, রাত্রি কি দুপুরে ;
আশ্বাস আনন্দ দেয় প্রান্তরের সবুজ ফসল,
চাষীদের দিন রাত হাড়ভাঙা খাটুনির ফল।

মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু মোষ ছাগল চরায়,
গুলী খেলে বিড়ি খায় মাঝে মাঝে বাঁশীও বাজায় ;
এখনো তেমনি নৌকো বেয়ে যায় মাঝি,
গান গায় প্রাণ খুলে গঙ্গায় পদ্মায়
মহানদী মেঘনায় রূপনারায়ণে।
বছর বছর আজো বান ডাকে দুঃখের নদীতে,
খেয়ালী বর্ষায় ভাসে দু'বাঙলার গ্রাম গ্রামান্তর ;
সাহায্যের ধ্বনি ওঠে বন্যার্তের ত্রাণে
দু'দিকের নগরে বন্দরে।

খেয়াঘাটে যাত্রীভিড় নিরন্তর চলে পারাপার
ফেলো কড়ি দাও পাড়ি দু'ধারেই আছে কর্ণধার !
পল্লীর হাটে বাজারে শহরে নিয়মিত বেচাকেনা,
ওধারে যেমনি এধারেও তাই বদলেনি কোনো ধারা ;
জারি-সারি আর মিছিলে-মেলায় যাত্রা ও কবিগানে,
আজিও তেমনি গ্রাম ভেঙে পড়ে ভাঙা এই বাঙলায়।

কুলি-কামিনের কামারের আর কুমারের,
ছোট দোকানীর আর কারখানা শ্রমিকের,
দিন কাটে দুখে এখনো তেমনি দু'ধারেই ,
পূবে পশ্চিমে দীনের কুটীরে সমান অন্ধকার,
সোনা আশ্বিনে দুখীর দুঃখ বেড়ে যায় চারগুণ ;
পূজা অঙ্গনে আলোর জলুষ আনন্দে মাতামাতি,
অন্য দিকে কী অন্ন অভাব নিদারুণ হাহাকার !
বৈষম্যের অভিশাপে সারশূন্য আগেও যেমন,
সে বাঙলা তেমনি আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

এখনো আগের মতোই এখানে সেখানে
শিশুদের অনেকের ঘুম ভাঙে ভোরের আজানে,
অথবা খঞ্জনি তালে ভক্তকণ্ঠে প্রাগ-ঊষা-কীর্তনে ;
ভিড় জমে লোকোৎসবে আগেরই মতন,
পুণ্যস্থানে মায়েদের সন্তানের মঙ্গল কামনা।
পূজায়-গাজনে কিংবা ঈদ-মহরমে
চাচা-মামা দাদু-ভাই ডাকা ডাকি যেমনি তেমন,
সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

গাঁয়ের পুকুর ঘাটে এবেলা ওবেলা
ঘড়া ও কলসী নিয়ে মেয়েদের মেলা,
কিংবা নিয়ে এঁটো কিংবা পূজোর বাসন
এখনো তেমনি বসে এধারে ওধারে।
সে আগেরই মতো আজো হৃদয়ে হৃদয়ে
দোলা লাগে মধুক্ষরা বসন্তের নম্র শিহরণে,
শহরের পথে পথে কলস্বর তরুণ-তরুণী
দু'ধারেই আরো বেশি সজীব উচ্ছল।

ফকির বাউল দুঃখী ভিখ মাগে আগের মতোই,
ঈশ্বরের দোয়া মেলে দাতা দিয়ে খুশি।

দু'বাঙলা এখানে এক, মানুষের মধ্যে ভগবান—
বাঙালী জীবন-সূত্রে এ তত্ত্বের পেয়েছে সন্ধান।
ধর্মভীরু মানবিক বলিষ্ঠ মনন,
সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

একই আকাশ তলে মিলে মিশে স্বচ্ছন্দ বিহার
দু'বাঙলার পাখিদের, কাকলির ওঠে ঐকতান।
এখন যদিও ঘেরা চারিদিক ঘোর অন্ধকারে,
অমৃতের ধারা নামে কুসুমের হাসির জোয়ারে।
এখনো তেমনি ভাবেই মান-অভিমান,
হৃদয় বদল চলে দু'বাঙলার পল্লীতে নগরে।
এদিকে উদ্বাস্তু কান্না ওপারেও দীর্ঘ হতাশ্বাস,
বিদেশীর ছলনায় বুক পেতে নিয়েছি আঘাত।
এ দুভোগ আমাদেরই পাপের ফলন,
তবুও সে বাঙলা আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

দিনে সূর্য, রাতে চাঁদ সহযোগী তারাদের নিয়ে
এখনো তেমনি রয় পাহারায় বঙ্গজননীর ;
সুন্দর সুন্দরবন বাঁধে আলিঙ্গনে,
চরণ যুগল ধুয়ে ধন্য মানে বঙ্গোপসাগর।
এখনো বাঙালী কাঁদে পলাশীর পাপে,
এখনো বাঙালী হাসে মিলনের প্রসন্ন তৃষায় ,
স্বরাজ পেয়েছি বটে ফিরে চাই সে হারানো মন.
সে বাঙলা এখনো আছে দুই ভাগ যদিও এখন।

অভ্যুদয়

(গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

যুগ যুগ গেল কেটে
অব্যাহত তবু দুঃসময়;
স্বাধীনতা এলো তবু
সর্বক্ষণ দুঃস্বপ্নের ভয়।
অবিচার অসম্মানে
মানুষের আত্মা নিপীড়িত;
সৌন্দর্য কল্যাণবোধ সব অপহৃত।
ভেদাভেদ হানাহানি
দিকে দিকে মৃত্যুর মিছিল;
হিংসা-দ্বেষ অসংযমে স্বভাব শিথিল।
এ মুহূর্তে এক যাচ্ঞা—
অন্ধকারে সত্যের বিজয়;
আলোকের দেবতার হোক অভ্যুদয়!

হারিয়ে না যাই

নিজের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্ত যখন,
সময় যখন ওলটপালট কথাব ভিড়ে;
বিকেল হলেই সেই পুরনো চিন্তা কেবল—
হারিয়ে না যাই হারিয়ে না যাই হাবিয়ে না যাই !

জীবনটাকে জামিন রেখে বিষুব রেখায়
সুখের নেশায় বসতে গিয়ে সিংহাসনে,
হোঁচট খেয়ে সেই পুরনো চিন্তা কেবল—
হারিয়ে না যাই হারিয়ে না যাই হারিয়ে না যাই !

ভালোবাসার বয়ন-রীতি জটপাকানো,
সারাক্ষণই স্মৃতির দেয়াল ভীষণ কাছে;
পাগল বাতাস জাহাজ-ডুবি চিন্তা কেবল—
হারিয়ে না যাই হারিয়ে না যাই হারিয়ে না যাই !

জোৎস্না জলে তৃষ্ণা বাড়ে বিপদ ভারি,
হাতড়িয়ে পথ যায় না পাওয়া বৃথাই খোঁজা;
আর কতদূর মধুপুরের ভাঙা সাঁকো—
হারিয়ে না যাই হারিয়ে না যাই হারিয়ে না যাই !

আমার ইচ্ছের ডালি

আমার জন্মের আগে আরেক পৃথিবী ;
তার কোনো ইতিহাস জানা নেই
রামায়ণী গানের মতন।
কারণ ভাস্বর : আমার জন্মের আগে
অন্য কোনো মহাকবি বাল্মিকী আসেনি।
তবু এক মহাকাশ-যাত্রার মতোই
সেদিনের জন্মক্ষণে
রাজকীয় সমারোহে এ মাটি মুখর।
শীতের শিউলি যেন ইচ্ছের শরীর,
ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন ভোরের শিশিরে ;
তারপর অবিরাম পরিচর্যা সুখে
কোমল সুতোয় গাঁথা শ্রেষ্ঠ উপহার।
জীবন বড়োই ব্যস্ত ;
দরজায় অহরহ হানা,
বারংবার কড়া নড়ে ওঠে।
কূলহারা সঙ্গীহীন সমুদ্রের পাখি
এখনো কি ঘুরে মরে অলস দুপুরে ?
রস টানে গাছের শিকড়
যতদিন বাঁচার তাগিদ—
ততদিন ফুল ফোটে, ফল ধরে, বাড়ে।
তারপর মৃত্যুর ডানায় চড়ে
দিনান্তের ফিকে রঙ আসে,
আমার ইচ্ছের ডালি শেষ উপহার
তোমাকেই দিয়ে চলে যাই।

সূর্যোদয়ের গান

জোর কদম,
জোর কদম—
লাফিয়ে চলি,
বাধায় দলি,
জোর কদম!

জোর কদম,
জোর কদম,
নতুন মন,
ভীষণ পণ
কী উদ্যম—
জোর কদম!

জোর কদম,
জোর কদম—
নামুক ঝড়,
ভাঙুক ঘর;
কিসের ভয়
হবেই জয়—
জোর কদম!

জোর কদম,
জোর কদম—
তরুণতীর্থে
সূর্যোদয়,
ঊষায় রাঙা
দিগ্বলয়;
এবার জয়
সুনিশ্চয়—
জোর কদম!

'অর্ধনগ্ন ফকির'

(গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

নিজের কথায় কহিতে যে পারে
সকল মনের কথা,
নিজের ব্যথায় বুঝিতে যে পারে
সর্বজনের ব্যথা ;
সেই জন লোকনাথ,
আঁধার পেরিয়ে তারি সাথে আসে
শুভ্র সুপ্রভাত।

'সবার উপরে মানুষ সত্য'
—সত্যই ঈশ্বর,
সেই সত্যের প্রকাশে প্রচারে
সত্যই নির্ভর।
তুমি সেই ন্যায়াধীশ,
এই পৃথিবীতে এসেছিলে নেমে
নাশিতে হিংসা বিষ।

শতবর্ষের শ্রদ্ধাবাসরে কান্নায় তর্পণ,
কোন্ অধিকারে করিব তোমার নামের উচ্চারণ ?

স্বাধীন ভারত অখণ্ডতায়
সাম্যে দীপ্যমান,
শোষণমুক্ত সংহত দেশ
'এক জাতি এক প্রাণ'
চেয়েছিলে দেখে যেতে,
পূর্ণ হয়নি সে আশা তোমার
ভেদাভেদ হিংসেতে।

হয়তো এখনো সে পাপ স্খালনে
তুমি আছ অনশনে,
আমরা যে-যার মত্ত রয়েছি
স্বার্থ অন্বেষণে।
তোমার তপের তাপে
বিশ্বাস আছে দীনের অশ্রু
নিশ্চয় মুছে যাবে।

ওহে বিপ্লবী গ্রাম-স্বরাজের মহাকবি সুরকার,
শতবর্ষের শ্রদ্ধাবাসবে তোমায় নমস্কার।

অস্ত্রমাতাল অহংকারীরা
নয় তত বলীয়ান,
মনুষ্যত্বের মহিমায়
তুমি সর্বশক্তিমান।
বাণীমূর্তি তোমার জীবন—
মানব মুক্তি লক্ষ্য ঘোষণা,
ধ্যান-জ্ঞান দৃঢ় পণ।

নতুন যুগের কুরুক্ষেত্রে
সারথি কৃষ্ণ তুমি।
অভয় মন্ত্রে ডেকে তুলেছিলে
সুপ্ত ভারত ভূমি,
আবার অন্ধকার—
শান্তির দূত প্রেমের দেবতা
ফিরে এসো আরবার!

'অর্ধনগ্ন ফকির' গান্ধী তুমি সেই মহারাজ,
বিষ-জর্জর বিশ্বমানব তোমাকেই চাহে আজ!

অন্ধকার পুড়ছে

অন্ধকার পুড়ছে, দাউ দাউ করে কেবলি পুড়ছে।
সেই জ্বলন্ত আগুনের চোখ-ধাঁধানো আলোকেই
আমি দেখছি দাউ দাউ করে অন্ধকার পুড়ছে
ভারতে এবং পাকিস্তানে। পুড়ছে অজ্ঞতা, অশিক্ষা;
পুড়ছে কুসংস্কার। কায়েমী স্বার্থের শিবির জ্বলছে,
আর ধ্বসে ধ্বসে পড়ছে এক এক করে। তারই ছায়া
আমার কবিতায়। এ আগুন নেভানোর সব চেষ্টাই বৃথা,
ফায়ার ব্রিগেডগুলি মিছেই দৌড়ে দৌড়ে হয়রান;
অসীম ক্লান্তিতে নিশ্চেষ্ট, নিরুপায় বোধে নিরুদ্যম।
অন্ধকার তাই পুড়ছেই, দাউ দাউ করেই পুড়ছে;
সেই জলন্ত আগুণের চোখ ধাঁধানো আলোকেই
আমি দেখছি ঠিক যেন দাবানলে অন্ধকার পুড়ছে
ভারতে এবং পাকিস্তানে। এবং তা' দেখে কেবলই
আমার মনে হচ্ছে, গোটা ভারত-পাকিস্তানকে
অগ্নিশুদ্ধ ও মৈত্রীবদ্ধ না করে বুঝি তার তৃপ্তি নেই,
নিবৃত্ত হবে না সে হুতাশন। ক্ষুধার আগুণ ভয়ংকর—
সেই আগুণেই অন্ধকার পুড়ছে দাউ দাউ করে আর
সেই জ্বলন্ত আগুনের চোখ-ধাঁধানো আলোকেই
আমি নতুন প্রভাতে নতুন যুগের সূর্যোদয় দেখছি
আমার ভারত রাষ্ট্রে এবং আমার পাকিস্তানে।

রাত্রিকে দিনকে

আকাশের সীমানা পাইনা,
সমুদ্রেরও পাইনা,
দিন ফুরোলেই রাত্রি।
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাতও শেষ!
রাত্রি, তোমায় একটি প্রশ্ন :
তোমায় কেন আরো
অনেক ক্ষণ ধরে পাওয়া যায় না?
তা' হলে আরো ঘুমুতে পারতাম,
আরো কত স্বপ্ন দেখতে পারতাম!

আকাশের সীমানা পাইনা,
সমুদ্রেরও পাইনা,
রাত ফুরোলেই দিন।
কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিনও শেষ!
দিন, তোমায় একটি প্রশ্ন :
তোমায় কেন আরো
অনেকক্ষণ ধরে পাওয়া যায় না?
তা'হলে আরো ভাবতে পারতাম
আরো অনেক কাজ করতে পারতাম

অবিরাম চিন্তার মিছিলে এক প্রশ্ন[redacted]

সে কোনো কথাই নয়,
হিংসুটে পাখির মতো
রাগ করে চলে যাওয়া
অথবা পালানো।
চারদিকে চৌকিদারি চোখ,
কোথায়ইবা রাখা নিরাপদে
হাতে পাওয়া স্বপ্নের পুতুলে ?
সেইতো বিষম জ্বালা।
সমুখের পশ্চাতের যতো দৃষ্টি
ঠিক যেন তীক্ষ্ণ বর্শাফলা।
আর কতো বিদ্ধ হবে
নির্বাক দাঁড়িয়ে ?
অস্ত্রের আঘাত থেকে
তোমাকে তো বাঁচতেই হবে।

চোখ-অন্ধ-করা রূপ
রাজপথে নিয়ন আলোয়,
সে আলোয় ছায়াপাত
অসামান্য লাবণ্য জেল্লায়।
তোমার হৃদয় জুড়ে
অবিরাম চিন্তার মিছিল।
সেতো আর কিছু নয়,
জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন ;
অসম্ভ্রম মৃত্যুর সামিল।
পরিষ্কার স্বীকারোক্তি চোখে—
মরতেই হবে জানা,

মরা তো সহজ—
বাঁচার মতন বাঁচা অনেক কঠিন।
সে বাঁচা কি কখনো সম্ভব,
ফুটপাথ ভাগ করে নিয়ে
ঘাসের তিন হাত ঘরে
যেইখানে থাকে তেরোজন
মেয়ে ও পুরুষে ?
তেমনি ঘরেরই এক স্থলপদ্ম তুমি,
তোমার দু'চোখে আর
তোমার চিন্তায় প্রশ্ন—
ঐ রাজভবনেতে ক'জন ঘুমায় ?

স্বপ্নে যখন এতো মিল

আমি এপারে তুমি ওপারে,
আমি এধারে তুমি ওধারে,
তবু আমাদের স্বপ্নে এতো মিল !
এই মুহূর্তে চাঁদ ডাকছে তো ডাকছেই,
চাঁদের হাতছানিতে কী অপূর্ব এক
মোহময়তা, তাকিয়ে থাকি বিস্ময়ে !
লুনা-এ্যাপোলোর ছুটোছুটি দেখছি ,
কিন্তু তোমার কথা তো ভুলতে পারছি না !

আমি এপারে তুমি ওপারে,
আমি এধারে তুমি ওধারে,
তবু আমাদের স্বপ্নে এতো মিল !
বিজ্ঞানের দৌলতে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যখন
একাকার হবার পথে সেই মুহূর্তে
অনেক মূল্য দিয়েআমরা ভাগ হয়েছি,
অনেক লাভের লোভেই ভাগ হয়েছিলাম ,
কিন্তু আজ আর বুঝতে বাকি নেই
বিযুক্তির কি দারুণ যন্ত্রণা, কি বেদনা !

ঋষি তাই বলেছেন অখণ্ডতার কথা, ঐক্যের কথা
অখণ্ডতার মধ্যেই পরিপূর্ণ শক্তি বিধৃত,
আর সেই শক্তিরই ফলশ্রুতি পূর্ণসিদ্ধি ।
এধারে আমি সেই পূর্ণসিদ্ধির স্বপ্ন দেখছি,
তুমিও সেই একই স্বপ্ন দেখছো ওধারে ;
বাস্তবিকই আমাদের স্বপ্নে এতো মিল !
চিরকাল ধরে সবাই জেনে আসছে—

পাখিরা নিয়ে আসেই নতুন ভোরের খবর।
সেই পাখির ডাক আমিও যেমন শুনছি,
ওপারে তুমিও ঠিক অমনি ভাবেই শুনছো।

এক মহাবিপ্লবী ঋষির ডাকের অপেক্ষায়
তুমি এবং আমি এবং আমরা সবাই অপেক্ষমান।
যখনই এসে সেই মহানায়ক ডাকবেন
উদাত্ত কণ্ঠে 'মামেকং শরণং ব্রজ' বলে,
তখনই আমাদের সেই সর্বনাশা ভুল ভাঙবে,
আমাদের সবারই তখন সেই কালঘুম টুটবে ;
এপারে ওপারে সবই তখন পরিষ্কার হয়ে যাবে—
তুমি ছাড়া আমি এখানে সম্পূর্ণই অর্থহীন,
এবং আমি ছাড়াও তুমি সেখানে একান্তই অপূর্ণ।
তাইতো আমাদের পরস্পরের মধ্যে এতো আকর্ষণ,
মনেপ্রাণে আমি যেমন তোমাকে চাই তুমিও আমায়,
সেজন্যেই তুমি ওপারে এবং আমি এপারে থাকলেও
তোমার এবং আমার স্বপ্নের মধ্যে এতো গভীর মিল!

অন্ধকারের পাতা ঝরছে

এখন আমি এক অস্তগামী সূর্যকে দেখছি,
অন্ধকারের সমুদ্রে আকাশটা ক্রমেই ডুবে যাচ্ছে।
আধুনিক কবিতায় শব্দের শাবকদের খেলা বেশ
উপভোগ করতে পারলেও, ঠিক এমনি সময়ে
আমি হাসতে অপারগ। এমনকি সার্কাসের সেই
বেঁটে জোকারটাও আমায় সেদিন হাসাতে পারেনি।
এই মাগ্‌গি বাজারে হৃদয়ের মূল্যও বেড়েই চলেছে,
পদে পদে খেসারৎ দিয়ে যখন পথ চলতে হয়
তখন আমি হাসতে পারি না, শুধু অভিনয় দেখি!

এখন আমি এক অস্তগামী সূর্যকে দেখছি,
অন্ধকারের সমুদ্রে আকাশটা ক্রমেই যখন ডুবে যাচ্ছে
তখন আমার হাসবার কথাও নয়, ভাববার কথা।
আমি দেখছি, এ মুহূর্তে এ সমাজ বল্গাহীন ঘোড়া ;
রাস্তার মোড়ে মোড়ে জনতার ভিড়ে দেখি ক্ষণে ক্ষণে
চেহারা বদল, শহরের শরীরের প্রতি রোমকূপে
বিষম বিষের জ্বালা, প্রতিবাদে ইন্ধনই জোগায়।

এমনি পরিবেশে আমি মরুভূমি হয়ে যাই একেবারে,
হঠাৎ স্বপ্নের রাজ্যে রঙ-বেরঙের একরাশ রৌদ্রের বেলুন
যখন আবার উড়তে শুরু করবে, কেবলমাত্র তখনি
আমি আবার প্রাণখুলে হাসতে পারবো, তার আগে নয়।
এখন আমি কেবল অজানা অন্ধকারের পাতাগুলি
কিভাবে এক এক করে খসে পড়ছে সবিস্ময়ে তাই দেখছি

আমার মৃত্যুতে একটি ঘোষণা

শক্তিময় অক্ষরের অপূর্ব বিন্যাস, আর
অপরূপ চিত্রকলা শ্রীমতীর পায়ের পাতায় ;
আমার মৃত্যুর আগে প্রাণভরে কেঁদেছিলো
মুমূর্ষু স্বপ্নেরা। জীবনের উজ্জ্বল উৎসবে
বৃত্তাকার ভালোবাসা সুগভীর উচ্ছ্বাসে লালিত,
অকস্মাৎ একদিন বিদ্ধ হবে আঁধারের অন্তিম
ফলায়,—সবই জানা ! সারস্বত অন্বেষণে তাই
প্রবিষ্ট চেতনা আর অভিলাষ উচ্চাকাঙ্খা
সকলি বিফল। ঠিক যেন সন্ধিক্ষণে ভাগ্যের শিকার।
তবুও বাউল মন রঙ্গমঞ্চে আত্মরতি মগ্নতায় ভাসে ;
মৃত্তিকার মোহে মত্ত মূর্তি যেন একটি আশার
রক্তমাংস-অস্থিহীন ছায়া হয়ে নিঃশব্দ চরণে
ঘুরে মরে নগরীর রাজপথে পল্লীর প্রান্তরে।
শ্মশান হাওয়ায় গন্ধ, চিত্রগুপ্ত সুদক্ষ হিসেবী।
তথাপি মাতাল ছন্দে গূঢ়তম একটি ঘোষণা :
মুহূর্তে অনাথ বিশ্ব অবিশ্বাস্য আমার নির্বাণে !

কীর্তিনাশার ডাক

তার চেয়ে চল অন্য কোথাও দল বেধে যাই,
হাড়ের মালা গলায় পরে পথ চলি চল।
চোখের জলে ভিজবে চিড়ে, হয় কখনো ?
হাত কচলে নকরি পাওয়া স্রেফ দুরাশা।
কীর্তিনাশার নেশায় মেতে করলে কিছু
এইটুকুতো হবেই হবে, লাগবে চমক—
কালাপাহাড কালাপাহাড় কালাপাহাড় !

সামনে বসে দাঁড়িয়ে থেকে দিন কেটে যায়,
নাটক নভেল শেষ হয়ে যায় পরের পরে।
এইভাবে কি সহজ ব্যাপার ধৈর্যধরা ?
তার চেয়ে চল অন্য কোথাও দল বেধে যাই,
ভেঙে চুরে পথ করে নিই আপন হাতে—
কালাপাহাড় কালাপাহাড় কালাপাহাড় !

কীর্তিনাশার নেশায় মেতে করলে কিছু,
বানের জলে ভাসিয়ে দিলে সারাটা দেশ,
এই টুকুতো হবেই হবে লাগবে চমক—
কালাপাহাড় কালাপাহাড় কালাপাহাড !
অনাহারী ছিন্নবসন নিরাশ্রিত,
আর কত কাল এমনি হবে আত্মঘাতী ?
কালাপাহাড় কালাপাহাড় কালাপাহাড় !

ডালে-ঝিলমে

কার নিমন্ত্রণে যেন মনে জাগে ইন্দ্রধনু রঙ,
অন্তরের হাসি তোলে ভূমিকম্প শরীরের
শাখা প্রশাখায়।
মানস গঙ্গায় ঢেউ, ডাল লেকে শিকারার মেলা,
এখানে সেখানে দেখি ভাসমান কুসুমের বাগ ;
হঠাৎ হঠাৎ হাঁক 'জাফরান, জাফরাণ চাই'!
রোদ্দুরের পোড়াগন্ধ উর্ধ্ববাহু অরণ্য ছায়ায়,
পাহাড়ের গায়ে গায়ে দূরে দূরে তুষার প্রলেপ।
হাতে হাত ঘড়ি বটে, বন্দী নয় সময় স্বাধীন ;
ঘড়িতে যখন আট জ্বলে ওঠে আলো যেন চোখ।

পৃথিবীর যত দেশ বোটে বোটে নাম পরিচয়,
বানিজ্য শিকার ; কোথাও কাকলি ওঠে, মঞ্জুরিত
কোথাও গুঞ্জন। পাখির প্রাণের মতো নিতান্ত নরম
আপেল আপেল গাল, কাশ্মীরের গোলাপী মেয়েরা
দল বেঁধে শিকারায় আমাদেরই পাশ কেটে যায়।
ক্লান্ত নারী-পুরুষেরা আজীবন লৌকিক সংগ্রামে,
মনে হয় চেনারের মতো উঁচু হয়ে কেউ যেন উচ্চরবে
বলে বলে যায় ডাল আর ঝিলমের তীর ধরে ধরে
—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, এইবার মুক্ত হতে চাই!

শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে

কেন আর নিচে পড়ে থাকা,
চলোনা ওপরে যাই, অনেক ওপরে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।
এক দুই গুনে গুনে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
চলোনা ওপরে যাই, অনেক ওপরে।

সেরা দান ভারতের বৈদিক ঋষির—
এক থেকে নয় আর শূন্য আবিষ্কার,
গাণিতিক অঙ্ক অন্তহীন !
সেই অঙ্ক গুনে গুনে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
চলোনা ওপরে যাই, অনেক ওপরে।

সর্বাঙ্গে জড়ানো আজ বসন্তের
উৎসবের সুখ। একটি নক্ষত্র হতে
আমি কি পারি না ? প্রত্যহের প্রতিধ্বনি
স্তূপীকৃত রাত্রি আর দিনের পাহাড়ে।
নতজানু মনের প্রার্থনা :
আমাদের স্থান হোক সপ্তর্ষি মণ্ডলে।

কেন আর নিচে পড়ে থাকা,
চলোনা ওপরে যাই, অনেক ওপরে
এক দুই গুণে গুণে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

আমি-তুমি চলো যাই, গিয়ে দেখি
কি আছে সেখানে শূন্যের পরেও ওপরে ;
চলো যাই খুঁজে খুঁজে দেখি
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
একই মন কেন চায় লক্ষ মন ছুঁতে।

একটি জিজ্ঞাসা স্থির, মূর্ত শবদেহ
রমণীয় গ্যালারির প্রান্তিক ছবিতে :
আর কতো দূরে কিংবা কতোটা ওপরে
এইভাবে যাওয়া যাবে অঙ্ক গুনে গুনে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ?

অনেক অনেক দূরে তাই যদি হবে,
তবু কেন নিচে পড়ে থাকা,
মিছিমিছি নিচু হয়ে থাকা ;
তার চেয়ে চলো যাই, অনেক ওপরে
এক দুই গাণিতিক অঙ্ক গুণে গুণে
শব্দের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

ঢেউ ঢেউ

সেদিন সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
কেবলই ভাবছিলাম—একটি মাত্র প্রশ্নই
প্রথমে আমাকে উদ্বেলিত করে তুলছিল।
সে প্রশ্ন, কবে থেকে এই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি
ঢেউ-এর যাত্রা শুরু হয়েছে সমুদ্রের বুকে
মায়ের বুকে বিশ্বময় শিশুর খেলার মতো ?
তারপর একের পর এক আরো বহু জিজ্ঞাসা—
কোথা থেকে এবং কবে থেকেই বা আরম্ভ এই
তরঙ্গ মিছিলের, আর কোনো দিনই কি অবিরাম
এই শোভাযাত্রার অবসান ঘটবে ? এবং একি
শুধুই খেলা ? কেইবা এই খেলার খেলোয়াড় ?
অনাদি অনন্তকাল ধরে কোনো খেলাই কি
এমনি ভাবে চলতে পারে ? এই শেষ প্রশ্নের
সরাসরি শেষ উত্তর—নিশ্চয়ই চলতে পারে
তেমন খেলোয়াড় হলে। এযে পরম সত্যেরই এক
অবিশ্বাস্য স্বরূপ। জীব জগতের জীবনগুলিওতো
সবই ঢেউ। কবে থেকে সেই জীবন মিছিলের শুরু
এবং কোনো কালেই সে মিছিলের শেষ হবে কিনা
কে তা বলবে ? মায়ের বুকের ওপর সংখ্যাহীন এই
জন্মমৃত্যুর তরঙ্গ-শিশুর খেলারও সত্যি শেষ নেই।

যখন আর কবিতা লিখবো না

মাছেরাই জানে চিলের চোবলে
মৃত্যুর কি স্বাদ।
তখন চতুর্দিকে নিঃসীম অন্ধকার।
স্বাধীনতা ও সাম্রাজ্যের
সমস্ত স্পর্ধিত দম্ভ মুহূর্তে বিলীন,
অনাহত আনন্দ নির্মূল।

আয়নায় মুখ দেখে কি লাভ?
ধীরে ধীরে ধরা দেওয়া
বার্ধক্যের কাছে। সে সংবাদে
কোন প্রয়োজন? তার চেয়ে
রোদ-ঝলসানো পথে-প্রান্তরে
কিংবা শস্য-সবুজের মেলায়
নিজের ছায়া দেখায় অনেক তৃপ্তি।

আসলে রোদ আমাদের চাই-ই,
তোমার আমার সকলেরই চাই
আমাদের প্রাণগুলিকে উত্তপ্ত
এবং তাজা রাখার জন্যে।
রোদের ভেতরেই যে সৃষ্টির সমারোহ,
মৃত্যুর বীজ খুব সহজে মাথা তুলতে
পারে না সেখানে।
দেখছি এখনো আমার চারদিক জুড়ে
ক্রমাগতই সূর্য-সোনার কণা ঝরছে!

ঐ কণাগুলিই আমার বিন্দু বিন্দু পরমায়ু,
জীবন-পূজায় আমার সুরভিত রক্তাঞ্জলি।

আমার কবিতা সূর্য-বন্দনারই মন্ত্র,
সূর্যই যখন জীবনের জীবন্ত প্রতীক—
আমার কবিতা জীবন-বন্দনারও মন্ত্র।
সূর্যকে সাথী করেই আমি বেঁচে আছি,
তাই আজো আমি আনন্দে কবিতা লিখছি ;
যে দিন আর লিখবো না সেদিনই আমার মৃত্যু

ওরা শিল্পী

বুকের রক্ত ওরা ঠোঁটে মেখে নিয়ে
মুঠো মুঠো হাসি বিলিয়ে দেয় জনতার
মধ্যে, রক্তাক্ত সে হাসির ফোঁয়ারা।
দুয়ারে দুয়ারে রূপের পসরা সাজিয়ে
রোজ এসে আলোর নিচে দাঁড়ায় ওরা।
মৃগয়ার কলরবকে উৎসব বলে ভুল করে
অনেকেই। ছলনায় যে ওরা সিদ্ধহস্ত!
কিন্তু অন্তরে ওদের তীব্র দাহ, যদিও
বুঝতে চায়না কেউ সেই দুঃসহ যন্ত্রণা।
শিল্পীতো ওরা বটেই, দেহ শিল্পের
কারবারী ওরা। তাই ওদের হাত ছানিতে
অনেক পথচারীই থমকে দাঁড়ায়—
ওদের এক এক জনকে কাছে পেতে চায়,
আরো কাছে, ঘনিষ্ঠ কাছাকাছি।
এ যেন অনেকটা মাছিদের কোলাহল
মিষ্টান্নের ঘ্রাণে, কিংবা কাঠালী ফুলের
গন্ধে রাখালের সহহীন আকুলতা যেন।
দোলা লাগে ক্লান্তিচাপা রাতের ছায়ায়,
কেঁপে কেঁপে ওঠে শিল্পী হরিণী শংকায়
রূপোপজীবনী অতিথির আপ্যায়নে।
অরণ্য হয়ে ওঠে শহর জনপদগুলি,
আর সবার অলক্ষ্যে বাতাসের স্রোতে
ভেসে চলে সময়ের কান্নার কুসুম।
বুকের রক্ত ওরা ঠোঁটে মেখে নিয়ে
মুঠো মুঠো শুধু হাসিই বিলি করে;
ব্যথার দেবতা, শিল্পীতো ওরা বটেই।

সীমানার দেয়ালে আস্থা নেই

ভারতকে যতই ভাগ করো,
ভাগাভাগি করো একের পর এক
আরো নানা দেশকে,
সুবিদাবাদী পাণ্ডাদের
সীমানার দেয়ালে
আমার একটুও আস্থা নেই।
তবু তা না মেনে নিয়ে উপায়ও নেই ;
এই যা বিপদ !
এই পৃথিবী এক অখণ্ড সত্তা,
নান বর্ণের ও নানা বৃত্তির
মানুষ তার অধিবাসী।
বিভিন্ন ভাষায় তারা কথা বলে,
বলুক। রকমারি তাদের আহার-বিহার
এবং পরিধান পরিবেশ,
হোক না, তাতেই বা কি ক্ষতি ?
জীবনের হাসি-কান্না এবং
সুখ-দুঃখ যে সবারই সমান !
সেই আনন্দ-বেদনাইতো
একই বিশ্ব-পরিবারের মূল বন্ধন !
তা'ছাড়াও সঙ্গীতের সেই একই
শাশ্বত সুর প্রাচ্যে এবং প্রতীচ্যে
এবং দুই মেরু অঞ্চলের সর্বত্র।
সারা ভুবন জুড়ে একই ধরণের
আলোছায়া এবং চিরন্তন সেই
জীবন-মৃত্যুর খেলা।
এরপরেও কী করে বলবো যে
আমরা পৃথক, আমরা পরস্পরে পর ?

যেখানেই যাই না কেন
ফুলের মতো সব শিশুগুলিকে
ভীষণ ভালো লাগে।
বিরাট বিরাট এক একটা পাহাড় দেখে
বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াই,
সমুদ্রের বিরামহীন কল্লোলে
অসীমের ডাক শুনি।
মাঠের ফসলে ফসলে
আশার অঙ্কুর চোখে পড়ে।
সর্বত্রই তো একই চিত্র!
কাজেই কী করে বিশ্বাস করবো,
পরস্পরে আমরা পর?
অখণ্ড মানব সত্তাকে উপেক্ষা করে
খণ্ড সত্যকে কী করে
মনে প্রাণে গ্রহণ করবো?
তবু তা না মেনে নিয়ে উপায়ও নেই,
এই যা বিপদ!
কিন্তু ভারতকে যতই ভাগ করো,
ভাগাভাগি করো একের পর এক
আরো নানা দেশকে,
সুবিধাবাদী পাণ্ডাদের
সীমানার দেয়ালে
আমার একটুও আস্থা নেই;
আসলে আমরা সমস্ত মানুষ
কেউ কারুর কাছে পর নই,
সবাই সকলের আত্মীয়।
সত্যি, সুবিধাবাদী পাণ্ডাদের
সীমানার দেয়ালে
আমার বিন্দুমাত্রও আস্থা নেই।

অগ্নয়ে স্বাহা

(নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষে)

সে আগুন জ্বলছেই.
আমরা তারই উত্তাপে
এখনো বেঁচে আছি।
সে আগুন জ্বলবেই,
আমরা তারই উত্তাপে
চিরকাল বেঁচে থাকবো।

সে আগুন তার জিহ্বাকে
ক্রমেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে
সমস্ত জঞ্জালকে পুড়ে ছারখার করার জন্যে,
আমাদের অগ্নিশুদ্ধ করে অক্ষয় অমর করার জন্যে।
সে আগুন জ্বলছেই,
আমরা তারই উত্তাপে
এখনো বেঁচে আছি।
সে আগুন জ্বলবেই
আমরা তারই উত্তাপে
চিরকাল বেঁচে থাকবো।

লেলিহান সে অগ্নি-জিহ্বা
ক্রমেই দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে
সমস্ত অন্যায় অপশাসনকে দগ্ধ করার জন্যে,
সমস্ত লোভ এবং অসাম্যকে দূর করার জন্যে।
সে আগুন জ্বলছেই,
আমরা তারই উত্তাপে
এখনো বেঁচে আছি
সে আগুন জ্বলবেই.
আমরা তারই উত্তাপে
চিরকাল বেঁচে থাকবো!

ওঁ শান্তি

কেউ না জানে সেই তো ভালো,
আত্মা-দীপে জ্বালিয়ে আলো
সৃষ্টিলোকে নিজেকে চাই রাখতে,
নির্বিবাদে নিরিবিলি
ফোটে নাকি গোলাপ কলি,
কেউ যেন না আসে আমায় ডাকতে।
নাই বা হলাম ভারত-রত্ন
নাই বা পেলাম পুরস্কার
শান্তিতে দাও নিজের মতো থাকতে,
যতো ইচ্ছে চালাও হুজুগ
তোমরাই হও মন্ত্রী হুজুর
শান্তিতে দাও জীবন-ছবি আঁকতে।
ঐ রয়েছে শহীদ মিনার
যে যতো চাও ভাষণ বিলাও
একটুও সাধ নেই কিছু তার জানতে,
শান্তিটুকু পেলেই হলো
কথার মালা গেঁথেই খুশি
জীবন যদি বোঝা না হয়
আমরা রাজী সব রাজাকেই মানতে।

এপ্রিলকে আমি ভালোবাসি

(লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

এপ্রিল।
জীবন-বসন্ত উৎসবের মাস এপ্রিল।
সুন্দর এই এপ্রিল মাসটিকে আমি ভালোবাসি।
পৃথিবীর মানুষ এই এপ্রিলেই, বাইশে এপ্রিল,
অতুলনীয় উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের সন্ধান পেয়েছিল।
সুন্দর এই এপ্রিল মাসটিকে তাই আমি ভালোবাসি।

পৃথিবীর মানুষের মানস লোকে সেই তারাটি
আজও তেমনি অসামান্য দীপ্ত।
এই পৃথিবীর মাটিতে এপ্রিলেই, বাইশে এপ্রিল,
তাঁর অবিনশ্বর অতি-মানবীয় আবির্ভাব।
সুন্দর এই এপ্রিলকে আমি তাই এতো ভালোবাসি।

একটি অপূর্ব স্বপ্নের রূপ ঐ অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্রটি,
অনির্বাণ একটি শিখার মতোই সেই স্বপ্নটি জ্বলছে,
জ্বলবেও চিরকাল। সেই স্বপ্নেরই একটি সুর ভোলগার
কলধ্বনির সঙ্গে মিশে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দিগদিগন্তে।

সেই স্বপ্ন আর সেই সুরই ক্রমাগত রচনা করে চলেছে নতুন যুগের ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় রূপায়িত হয়ে চলেছে মানব মুক্তির পরম কাম্য এক নতুন স্বপ্ন শতবর্ষ আগের ঐ পুণ্য দিন বাইশে এপ্রিল থেকে।
সুন্দর এই এপ্রিলকে আমি তাই এতো গভীরভাবে ভালোবাসি

মুক্তির গান, মৈত্রীর গানে সারা পৃথিবী আজ উদ্ভাসিত,
সাম্যের গান, ন্যায়ের গানে সারা পৃথিবী আজ উল্লসিত।
পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে আজ জীবন বসন্তের উৎসব চলেছে,
সে উৎসবের সূচনা হয়েছে একশ বছর আগের সেই এপ্রিলে।

আর একশ বছর পর এই এপ্রিলে ঐ স্বপ্নেরই এক মনুমেন্ট
মানুষের কল্যাণে তৈরী হবে বিশ্বশান্তির ঐকান্তিক উদ্বোধনে।
তারই সাড়া পড়ে গেছে আজ দিকে দিকে দেশে দেশে.
দাসত্বের শৃঙ্খলগুলি একের পর এক খসে পড়েছে
আর শান্তির সেতু সর্বত্র গড়ে উঠছে জাতিতে জাতিতে
ঐ নক্ষত্র নির্দেশিত মানুষে মানুষে সহাবস্থানের ভিত্তিতে।
সেই শান্তিরই মহোৎসব শুরু হয়েছে লেনিন শতবার্ষিকীতে,
এপ্রিলতো উৎসবেরই মাস, জীবন বসন্তের উৎসবে মুখর।
সেই উৎসবের প্রাণপুরুষের আবির্ভাব দিন বাইশে এপ্রিল,
সুন্দর এই এপ্রিলকে আমি তাই এতো গভীরভাবে ভালোবাসি।

আলো বাতাস

(লেনিন জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

কবাট জানালা সব বন্ধ করে রেখেও
আলো-বাতাসকে ঠেকানো যায় নি।
ওদের সব চেষ্টা সব সতর্কতা বিফল হয়েছে,
সব বাধা সব প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে দিয়ে
নানা ছিদ্র পথে ঢুকে পড়েছে আলো-বাতাস।
প্রচণ্ড সে আলোক-দ্যুতি এবং
হাওয়াও অত্যন্ত প্রবল ও বেগবান।
পৃথিবীময় আজ সেই আলো বাতাসেরই
উচ্চরব কোলাহল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত।
আলো-বাতাস ছাড়া কি করেই বা বাঁচা যায় ?

যারা খেটে খায় –
জাল ফেলে মাছ ধরে নদীতে সমুদ্রে,
মোট বয়, চাষ করে, কলম চালায়,
কিম্বা কল-কারখানা বা জাহাজী শ্রমিক
কে জানে না তার কথা, কে শোনেনি নাম ?
মুখে মুখে তাঁরই বাণী, চোখে চোখে তাঁরই স্বপ্ন-ছায়া
তোমার আমার মধ্যে জাগে তাঁরই প্রাণ-মন-কায়া।

সত্যকে তো আর হত্যা করা যায় না,
সত্যের বাণীও তাই শাশ্বত অমর ;
বসন্তের জীবন-বার্তার অগ্রগামী বাহক
লেলিনের আত্মা তারই অনির্বাণ শিখা ;
সে শিক্ষা শতবর্ষ ধরে যেমন জ্বলছে,
হাজার বছর পরেও ঠিক তেমনি জ্বলবে।